একটি মৃত্যু অনেক স্বপ্ন
অনেক মৃত্যু একটি স্বপ্ন

সম্প্রতি ব্রাজিলের রাজধানী রিও'তে সমাপ্ত হলো বিশ্ব যুব দিবসের উনিশ দিনব্যাপী কর্মসূচীর জমকালো অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শেষ দিনে ছিলো 'পাপাল মেস' বা পোপ মহোদয় দ্বারা পরিচালিত উপাসনা। কোপা ক্যাবানা বিচে উদ্‌যাপিত হয়েছিলো এই ধর্মীয় উপাসনা পর্বটি। পৃথিবীর সর্বকালের দ্বিতীয় সবোর্চ্চ বড় এ আন্তর্জাতিক জন সমাবেশে প্রত্যেকটি দেশের প্রতিনিধিদের মিলনে 'থ্রি মিলিয়ন বা ত্রিশ লক্ষ' তরুন তরুনীর সমাগম ঘটেছিলো। ত্রিশ লক্ষ সংখ্যাটি শুনতেই মনের মধ্যে একটা সূঁচালো আঘাত টের পেলাম। বাঙালীর জীবনে ৫২, ২১, ৭১ সংখ্যাগুলোর অবস্থান ব্যাপক ও প্রদীপ্ত। এই সংখ্যাগুলোর কোনো একটি কখোনো কাকতালীয়ভাবে নিজের বাড়ির, গাড়ি, টেলিফোন নাম্বার হিসেবে পাওয়া গেলে নিজেকে ভীষন সৌভাগ্যবান মনে হয়। অনেকে অবার স্বইচ্ছায় এই সংখ্যাগুলোকে লুফে নেন স্বদেশ প্রেম প্রকাশের লক্ষ্যে। তেমননি ত্রিশলক্ষ শব্দটিও ভীষন আবেগ মাখা। অর্থাত এই সমান সংখ্যক মহাপ্রাণের আত্মত্যাগেই রচিত হয়েছিলো প্রিয় বাংলাদেশ। যাঁদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ মানেই বোঝেনি। অনেকেই রক্ত ভীষন ভয় পেতো, হয়তো তাঁকেই বেনোয়েট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্ত বের করে হত্যা করা হয়েছে। যে ছুঁড়ি ভয় পেতো, তাঁকে হয়তো ধারালো ছুঁড়ি দিয়ে জবাই করা হয়েছে। বন্ধুক ভয় পেতো এমন অনেকের বুক বন্ধুকের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়েছে রক্ত পিপাসু হানাদার বাহিনীর হাতে। পৈশাচিকতা, বিভতসতা আর নৃশংসতার শিকার ত্রিশলক্ষ তাজা প্রাণ। ত্রিশলক্ষ মানুষকে একসাথে কখোনো দেখা হয়নি। তাই আধুনিক প্রযুক্তির সামাজিক মাধ্যম ইউ টিউব এর আশ্রয় নিলাম। এরিয়াল ভিউতে দেখলাম কোপা ক্যাবানা সৈকতে একসাথে ত্রিশলক্ষ মানুষের উপস্থিতি। মনে হল সারা পৃথিবীর মানুষ যেন জড়ো হয়েছে। পরক্ষনেই মনে হলো এতোগুলো নিস্পাপ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে নিজ মাতৃভুমিকে ভালোবাসার অপরাধে। শৃংখলমুক্ত হবার অধিকার প্রকাশের অপরাধে। খাকী পোশাকধারী ঐসব নরপশুদের সহায়তা করেছে স্বদেশী কতোগুলো মানুষরূপী হায়েনা। যুদ্ধাপরাধী হায়েনাদের অনেকের বিচার হলেও সকলের কাংখিত সাজা 'মৃত্যুদন্ড' এখোনো বাংলার মাটিতে সংঘটিত হয়নি। একদিন সবার স্বপ্ন ছিলো- বাংলাদেশ নামের দেশ। এখোন স্বপ্ন, রাজাকারবিহীন সবুজ বাংলাদেশ।

যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়, আপনার সবচেয়ে অপ্রিয় বিষয় কি? কেউ বলবে, তোতো তরকারি, বেশী উচুঁ ভালো লাগেনা, সাপ, মাকরসা, অন্ধকার, প্রতারণা আরো অনেক কিছু। আচ্ছা আপন মৃত্যু- কি প্রিয় না অপ্রিয়? এমন প্রশ্নে সবাই আত্‌কে উঠবে। একবাক্যে বলবে মৃত্যুকেই সবচে' বেশী অপছন্দ করি। সম্ভবত মৃত্যু বিষয়টিই পৃথিবীর সর্বাধিক অপ্রিয় শব্দ। মৃত্যু অনাকাংখিত হলেও তা অবধারিত। মৃত্যু অপ্রত্যাশিত অথচ নির্ধারিত। তবুও আমরা বেমালুম ভুলে যাই

আপন জীবনাবসানের কথা। পূণ্য বয়সে প্রাণের মৃত্যু ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্ত সে মৃত্যু যদি স্তব্ধ করে দেয় নবীন শিশু জীবনকে তখোন তা হয় অসহনীয় বেদনার। বাকরুদ্ধ করে দেয় নিকটতম মানুষদের। দীর্ঘদিন নিরারোগ্য অসুখে ভুগছিলো একটি শিশু। যদিও শিশুটির দৈনন্দিন চলাফেরা ছিলো অন্যান্য শিশুদের মতোই প্রায় স্বাভাবিক। কিছুদিন আগে এক সকালে হঠাত করে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লে জরুরীভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। সংবাদ পেয়ে সপরিবারে আমিও ছুটে গেলাম। পৌঁছে দেখি লাইফ সাপোর্ট দেয়া হয়েছে। অবস্থা যে আশংখাজনক বুঝতে দেরী হলোনা। মেডিকেল টিম এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। কিছুক্ষন পর পর শিশুটির মা বাবার সাথে মিটিং করেছে ভারপ্রাপ্ত ডাক্তাররা । সিদ্ধান্ত হলো পরের দিন সকালে সকল প্রকার লাইফ সাপোর্ট খুলে দেয়া হবে। সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পর শিশুটি দু'মিনিটও বেঁচে থাকতে পারে, আবার দু'মাসও পৃথিবীর আলো-বাতাস গ্রহন করতে পারে। এমন সিদ্ধান্ত দেয়ার পর মা-বাবা দু'জনই বিচলিত। হবারই কথা। যে সন্তান পিতামাতার সকল স্বপ্নের সমষ্টি- সে সন্তানকে নিজেরাই যেন অদেখা আধাঁরের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। পরের দিন অসংখ্য বন্ধু স্বজনের আগমন হলো ইনসেনটিভ কেয়ার রুমে। অনেকেই সজোরে কাদঁছে। কক্ষের চারিদিকের বাতাস বেদনায় যেন ভারী হয়ে গেল। কারো মুখের দিকে তাকাতে সাহস পেলাম না। চার্চের ফাদার এসে বিদয়ী প্রার্থনা করলেন। সোস্যাল ওর্য়াকার এসে মৃত্যুর পরবর্তী বিষয় নিয়ে নার্সদের সাথে কথা বলছে। মা-বাবা উপস্থিতিতেই লাইফ সাপোর্ট খোলার জন্য ডাক্তার এলেন। এখোন রুমের সবাই যেন হাউমাউ করে কাদঁছে। চোখের সামনে আপন সন্তানের মৃত্যু দেখার মতো অসীম সাহস ও শক্তি পৃথিবীর ক'জন মা-বাবার আছে আমি জানিনা। সাপোর্ট খোলা হলো। মনে হলো যেন রুমের মধ্যে উপস্থিত সকলের লাইফ সাপোর্ট খুলে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেকেরই যেন দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সবার চোখ স্থির হয়ে আছে শিশুটির মুখের উপর। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার মতো সঠিক উপলব্ধি এবং শব্দ আমার জানা নেই। জীবনে এই প্রথম কোনো বিষয়ের বর্ণনা করতে গিয়ে নিজেকে ভীষন অযোগ্য মনে হচ্ছে। কলমের অগ্রভাগ কাগজের সাথে বার বার করে আটকে যাচ্ছে। চোখের ভেতর ঘন জলের চলাচল টের পাচ্ছি। ভাবনার সমস্ত আকাশ ছেঁয়ে যাচ্ছে বিষাদ আর অস্থিরতায়। এক মিনিট, দুই মিনিটি করে অনেক মিনিট কেটে গেলো। শিশুটি ধীরে ধীরে সুস্থ্য হয়ে উঠলো। ডাক্তারা বললো, ইট ইজ মিরাক্যাল। কোনো প্রকার সাপোর্ট ছাড়াই বেড়ে নেয়া হলো তাকে। রাতে ঘরে চলে এলো মা-বাবার। আমিও বাসায় গিয়ে অনেক গল্প করলাম, দুষ্টামী করলাম শিশুটির সাথে। দেখতে পেলাম মা-বাবার চোখে আবারো চিক্‌চিক্ করছে হাজারো স্বপ্নের প্রাসাদ।

- প্রিয় পাঠক, পরের দিন সকালে শিশুটি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং সন্ধ্যায় জাগতিক সকল বন্ধন ছিন্ন করে চলে যায় আমাদের চেনা জানা পৃথিবীর বাইরে।